দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3
00L175

বাংলা ভাষা প্রচলনে বাধা শিক্ষা বৈষম্য

অনিরুদ্ধ

সর্বভারতীয় শিক্ষা কংগ্রেস ও বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিখানোর জন্য কলকাতায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তির পাদদেশে তারা এই অবস্থান ধর্মঘট করছেন। কলকাতার ইংরাজী পত্রিকা দি স্টেটসম্যানে খবরটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিখানোর দাবী সম্পর্কে শিক্ষা কংগ্রেস ও বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতির যুক্তি হল যে, ইংরাজী মাধ্যম স্কুলগুলো থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররাই একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে বেরিয়ে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার নীতি নিয়েছে বর্তমান সিপিএম নেতৃত্বে পরিচালিত বামপন্থী সরকার। তাদের আন্দোলন এই শিক্ষানীতির ইংরাজী শিক্ষাদান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে।

ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ। সেখানে সকল ভাষাভাষীর মধ্যে সাধারণ যোগসূত্র হিসেবে হিন্দীর প্রচলনে দক্ষিণ ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোর বিরোধিতা প্রবল। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে স্বীকৃতি দিলেও এবং তত্ত্বীয়ভাবে প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর মর্যাদা সমান হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানে সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হিন্দীকে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহিত করে আসছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত গত বছর 'সাপ্তাহিক দেশ'-এ প্রকাশিত (সেপ্টেম্বরের একটি সংখ্যা) ওখানে বাংলা ভাষার উপর এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে এখানে যারা একদিন বাংলা ভাষা কাফেরদের ভাষা, পৌত্তলিক ভাষা ইত্যাদি দোহাই দিয়ে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে আরবী এবং রোমান হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করেছে, তারা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার 'দুর্দিন' আবিষ্কার করে বাংলা ভাষা মুসলমানের ভাষা বলে এক নতুন জিগির তুলেছে। অথচ, সেদিন ডঃ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে বহু বিদ্বান বাংলা সাহিত্যে শুধু মধ্যযুগে মুসলমানদের অবদানের দৃষ্টান্তই নয়, মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের অনুরাগের উদ্ধৃতি দিয়েও উপরোক্ত অপপ্রচার বন্ধ করতে পারেননি।

এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর তীব্র আন্দোলনের মুখে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান আমলেই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা স্বীকৃতির পরও তারা একই মনোবৃত্তির কারণে আরবী এবং রোমান হরফে বাংলা লেখার সুপারিশ করেছিলেন। বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারায় হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী বলে কৃত্রিম ধূয়া তুলে বিভেদের প্রাচীর তুলতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় সেদিন যারা এখানে সহযোগিতা করেছিলেন ষাটের দশকে আইয়ুবীয় সামরিক শাসনামলে, তারাই আজ একইভাবে তৎপর আছেন। আর লক্ষণীয় বিষয়, সবসময়ই এরা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে ভালবাসেন। স্বাধীনতার পরও সকল সময়ই এরা ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থকরা অবস্থা বুঝে অবস্থান নিচ্ছে। দু'নৌকাতেই তারা পা রাখছেন। ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলভী আবদুর রহমান তার ভাষণে বলেছিলেন, "আমি মুসলমান এবং পূর্ব পাকিস্তানী।---এখন আমি আর বাঙ্গালী নই।" সাহিত্য সেবায় এই আদর্শের ভিত্তিতে সেদিনের আহ্বানের সাথে আজকে বাংলা ভাষাকে মুসলমানের ভাষা এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব আজও সঠিক বলে একুশে উদযাপন করেছেন এরা। বাংলা বাঙ্গালীর ভাষা একথাটা তারা কিছুতেই স্বীকার করতে নারাজ নন। সুবিধা ও সুযোগ পেলে তাদের এই ছদ্মবেশ খসে পড়বে এবং ১৯৭১ সালে শহীদ মিনার পাক সেনাবাহিনী গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর তাদের উল্লাস ও কার্যকলাপ তার প্রমাণ। এরাই ১৯৭৬ সালে সময় এসেছে মনে করেছিল। তাই সেদিন এক দৈনিকে শহীদ মিনার এবং মসজিদের মিনার ছাপিয়ে প্রশ্ন রেখেছিল; কোনটি মিনার। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে তারা এভাবেই নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

কলকাতায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গে এ পটভূমির কথা এজন্য উল্লেখ করা হল যে, এখানে ইংরাজী ভাষা নিয়ে একই ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। কারণ ভাষা আন্দোলনের মর্ম কথাকে পাশ কাটিয়ে সর্বস্তরে বাংলা চালুর শ্লোগানকে (প্রকৃতপক্ষে যে শ্লোগান হওয়া উচিত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা) কেন্দ্র করে এর অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করতে যেয়ে ইংরাজী ভাষার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়। ইংরাজী ভাষা অপরিহার্য কিনা সে প্রশ্ন যে আলাদা এবং তার জবাব ইতিবাচক হলেও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা কেননা, এবং দুয়ের মধ্যে তুলনা টেনে আনার পশ্চাতে দু' ধরনের বিভ্রান্তি কাজ করে।

বাংলা একাডেমীতে গত ২২শে জানুয়ারী মাতৃভাষার ব্যবহার শীর্ষক আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখলেন ডঃ কামাল সিদ্দিকী। সর্বস্তরে বাংলা চালুর ক্ষেত্রে এ যাবৎ ব্যর্থতাকে তিনি তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করার কারণে ইংরাজী ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় বলে তার যুক্তির কথাটা যাচাইয়ের প্রশ্নটি সামনে আসেনি। এখানে তার বক্তব্যের উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তার বক্তব্যের একটি যুক্তির কথাই বলবো। তিনি বলেছেন যে, ইংরাজীকে ত্যাগ করলে (আসলে এধরনের বক্তব্য কোন বুদ্ধিজীবী দেননি) ইংরাজী-জানা এবং ইংরাজী না-জানা শিক্ষিতদের মধ্যে স্বভাবতঃই সৃষ্ট বৈষম্যের সুযোগ গ্রহণ করবে ইংরাজী জানা সম্প্রদায়। তারা দেশের সকল কাজেই তাদের আধিপত্য বজায় রাখবে। অর্থাৎ ইংরেজী জানা সম্প্রদায়ই হবে এলিট শ্রেণী। ঠিক পশ্চিমবঙ্গেও একই প্রতিধ্বনি উঠছে। আর তাই অবস্থান-বিক্ষোভ। দু'ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে, যার ফলে ইংরাজী মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররাই সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে সমাজে স্থান করে নিয়েছে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যকর বক্তব্য নেই।

পশ্চিমবঙ্গের কথা থাক। ওদের বিষয়টি ওরাই সমাধান করবেন। আমাদের এখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তার ফাঁক পূরণ করতে এগিয়ে গেছে মডেল স্কুল-কলেজ এবং কিণ্ডারগার্টেন। আর ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি তো শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য জীইয়ে রাখার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নজির।

এসব শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হচ্ছেন তারাই যাদের সাধ্যে কুলোয়। এদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনে যারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। সাধারণভাবে শিক্ষিত শ্রেণী থাকবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে। এটা দূর করার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজী শিক্ষার সুপারিশ করছেন এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী। সন্দেহ নেই, তাদের আন্তরিকতায় কিন্তু ঠিক যে আর্থ-সামাজিক কারণে শিক্ষা বৈষম্য দূর করার কাজটি স্বাধীনতার পর ষোল বছরেও প্রাথমিক উদ্যোগও সফল হচ্ছে না, সেই একই কারণে এধরনের ব্যবস্থায় সামাজিক একটি প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় সৃষ্টির পথ এদ্বারা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সান্ত্বনা এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের কথিত নীতি চালু থাকলে অন্তত তারাও সুযোগ পাওয়ার আশা মনের মধ্যে পোষণ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গটির বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য বর্তমান বিরাজিত অবস্থার কথাটাই ভাবা যাক। আমাদের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা (সরকারীকরণ) ৪৪ হাজারের কিছু বেশি (৪৪,২২৪টি)। এতে দেশে মোট শিশুর মধ্যে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষাগ্রহণ করে। তারা আবার সবাই আর্থিক কারণে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া সমাপ্ত করতে পারে না। এরা প্রাথমিক স্তর থেকেই এদেশে ইংরাজী শিখছে। সকল শিশুকে অন্ততঃ বাংলায় স্বাক্ষর করে তুলতেও প্রয়োজন কমপক্ষে ৮০ হাজার প্রাথমিক স্কুল। বিদ্যমান সরকারী প্রাথমিক স্কুলের এক তৃতীয়াংশ স্কুল গৃহ, বেঞ্চ, শিক্ষক প্রভৃতির অভাবে যেটুকু শিক্ষা পাওয়া উচিত তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজী শিক্ষার উপর প্রাথমিক স্তরে জোর দিলে যে অর্থ ব্যয় হবে, তা শুধুমাত্র বাংলার মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত করলে, অন্ততঃ প্রাত্যহিক কাজকর্মে এবং নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে ব্যাপকভাবে এই বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারে। একান্ত রক্ষণশীল হিসাবেও শতকরা ৭৫ জন লোক আজ আমাদের দেশে নিরক্ষর। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যারা বিতর্ক করছি তারা সমাজের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ মাত্র। তর্কাতীতভাবে তারা

FEB 198
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

নিজস্ব অভিজ্ঞতা, শিক্ষাজনিত কারণে উন্নত চেতনার দ্বারাই পরিচালিত হয়ে প্রাথমিক স্তরেও ইংরাজী শিক্ষার অপরিহার্যতার পথে মূল্যবান যুক্তি আহরণ করেন।

তারাসহ শিক্ষিত শ্রেণীর সকলেই স্বীকার করবেন যে, ইংরাজী শিক্ষা অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণেই বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেই জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ আধুনিক মুক্তবুদ্ধির চর্চার সম্ভাবনার দ্বার এদেশে খুলে গিয়েছিল।

যেদিন এদেশে ইংরাজী না দেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে—এই বিতর্ক দেখা দেয় তাতে উনবিংশ শতকের পথিকৃৎ বলে যারা পরিচিত তাদের মধ্যে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। ইংরাজরাও এদেশবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রামমোহন রায় প্রমুখ আধুনিক যুগের প্রতিনিধিদের যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে দাঁড়িয়েই তারা ইংরাজী শিক্ষার কথাটা বলেছে।

ইংরাজরা নেহাত নিজস্ব প্রয়োজনে অর্থাৎ সংকীর্ণ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিশেষ এক ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে লর্ড ডালহৌসীকে লিখিত উড সাহেবের চিঠির কথা উল্লেখ করা চলে। তিনি লিখেছিলেনঃ আমি মনে করি উচ্চশিক্ষিত নেটিভরা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হবার সম্ভাবনা, যদি না তাদের চাকরি দেওয়া যায় এবং তাদের সকলকে চাকরি দিতে আমরা পারব না। ভবিষ্যতে যারা হবে নিন্দুক, সমালোচক ও বিক্ষোভকারী, এমনি একটি গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে আমি চাই না।

লক্ষ্য করার বিষয় উনবিংশ শতকে মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা স্পষ্ট করে বলেছে "যেহেতুক লোকে কোন নির্দিষ্টকালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় তত পর ভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না।---সকল দিক বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ধরা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে।" সেদিনও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভয়াবহ গণনিরক্ষরতার কথাটাই বিবেচনা করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে লিখেছিলঃ

"ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় যে বাঙ্গালা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আটজনমাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয়জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়---প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অতি সামান্য বিদ্যার্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে।"

আজকের অর্থাৎ এই বিংশ-শতাব্দীর শেষ প্রহরেও সেই অবস্থা অপেক্ষাও ভয়াবহ অবস্থা দেশে বিরাজ করছে। আমাদের লোক সংখ্যার ৮ কোটিই আজ নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা বেড়ে চলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসের মুখে অজস্র কিণ্ডার গার্টেনের দ্বীপপুঞ্জে যে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চলছে, তাতে উচ্চ শিক্ষায় ইংরাজীর ব্যবহার নির্বাধ হওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও তা সৃজনশীল মানসিক বিকাশের পরিবর্তে বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেনঃ "জনগণের নিজস্ব সরকারের একটা অর্থ ও বাস্তবতা রয়েছে কিন্তু অপর জাতি কর্তৃক অন্য জাতির জন্য সরকারের বিষয়টি তা নয় এবং তার কোন অর্থ ও বাস্তবতার অস্তিত্ব থাকে না। এক জাতি অপর জাতিকে তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে একটি স্থান, একটি মানব খামার তার নিজস্ব অধিবাসীর মুনাফার জন্য ব্যবহার করে থাকে।" রমেশ চন্দ্র দত্ত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "এই কঠোর ভাষায় রচিত বক্তব্যের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান সত্য অপেক্ষা আরও কঠোর সত্য নিহিত আছে। ইতিহাসে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতিকে শাসনের ক্ষেত্রে পদানত জাতির স্বার্থে শাসন করছে এমন একটিও নজির নেই।" স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশকে নতুন করে অর্থনৈতিক শোষণের জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান ভূমিকার বিশ্বস্ত প্রহরী হিসাবে এদেশের যে শ্রেণীটি কাজ করছে সেই শ্রেণীও স্বদেশের নিপীড়িতশ্রেণী-গুলোর স্বার্থে কাজ করছে, সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে নজির নেই। সেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদকে শুধুমাত্র সরকারী চৌহদ্দীর মধ্যে সীমিত রেখে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে চলেছে শুধু তাই নয়, তার চৌহদ্দী যে প্রশাসন ছাড়িয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণী অবস্থান হিসাবে বিস্তৃত তাকে অস্বীকার করেই শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজীর কথাটা টেনে এনে ধূম্রজাল যতটা সৃষ্টি হয়, উচ্চ শিক্ষায় ইংরাজীর ব্যবহারের কাজটা সেই মাত্রায় সম্পন্ন হয় না।

কোন জাতি দ্বিভাষী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। যদিও একটি রাষ্ট্রে বহু ভাষাভাষী জাতি থাকতে পারে এবং আছেও। আমাদের ক্ষেত্রে বড় সুবিধা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রটি একক ভাষা অধ্যুষিত। সেখানে নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য একটি দ্বিতীয় ভাষার প্রয়োজন নেই। বাইরের সাথে যোগসূত্রের জন্য দশ কোটি লোককে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে হবে এমন কোন প্রস্তাব কোন উন্মাদ দিতে পারে না। সুতরাং একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দেশের যাবতীয় কাজকর্ম মাতৃভাষায় পরিচালনার উপযোগী অবস্থা ও মানসিকতার অভাবের কারণেই বাংলা ভাষার ব্যবহার সংকুচিত থাকার মূলে কাজ করছে।

কোন কোন কিণ্ডারগার্টেনে বাংলা/ইংরাজী/আরবী তিনটি ভাষাই বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কোথাও একাধিক ভাষা শিখানোর ব্যাপারটা আপত্তিজনক নয়। কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টির মানসিকতার পিছনে যে উদ্দেশ্য বিরাজ করছে, তা উপেক্ষা করা চলে না।

একুশে স্মরণে আলোচনা সভায় অনেকের বক্তব্যে এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, মাতৃভাষার চর্চা এবং তার মাধ্যমে শিক্ষা দান কোন ভাষার বিরুদ্ধে নয়, হোক তা উর্দু কিংবা ইংরাজী। বরং মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই অন্যান্য ভাষা শিক্ষা এবং তার সম্পদরাজি সম্পর্কে আমরা আগ্রহী হতে পারি। সুষ্ঠু শিক্ষার মানসিকতা এবং সুশিক্ষা মানুষকে সংকীর্ণ করে না, বরং মুক্তবুদ্ধি-চর্চায় উৎসাহী ও উদ্যোগী হতে প্রেরণা দেয়।

আমাদের ভাষা আন্দোলন উর্দুর বিরুদ্ধে কিংবা ইংরাজী ভাষা বর্জনের বিরুদ্ধে ছিল না। শিক্ষা প্রসঙ্গে মাতৃভাষার দীনতাকে (উপযুক্ত বই-পুস্তক নেই এই অর্থে) যারা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তাদের জবাবে রবীন্দ্রনাথের কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়ঃ

"...বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুনডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধন হারা ব্যবসায়ে মুনাফা বলে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়---।"

সুতরাং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের দোহাই দেওয়ার আড়ালে রয়েছে উচ্চ শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠির জন্য রেখে দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ যোগ্যতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে যদি মাতৃভাষায় পুস্তক রচনাকে (উচ্চ শিক্ষার্থ) যোগ্যতা হিসাবে ধরা হত তবে নিশ্চয়ই 'উপযুক্ত পুস্তকের অভাব' অজুহাতটাকে এতদিনে ছুটি দেওয়া যেত। কিন্তু তা হবার নয়।

আমার মনে হয়, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের দিবসটি পার করা আবেগ নিঃশেষিত লগ্নে আমরা কী যুক্তি ও ধীর বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের দীনতাকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজনটি উপলব্ধি করব, না, শুধুই শহীদদের ত্যাগ ও স্বার্থবিসর্জিত কিছু ভাষা সৈনিকদের কর্মকাণ্ড স্মরণ করে আত্মতৃপ্তির রোমন্থন সুখ অনুভব করব? এই কঠিন প্রশ্নের জবাব আমাদের নিজেদের মধ্যে খুঁজতে হবে। শুধুমাত্র চক্রান্তকারীদের চিহ্নিত করা নয়, সরকারী ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ নয়, নিজেদের কাজটি নিজেরাই করতে শুরু করতে হবে।

মনে রাখতে হবে জাতির সৃজনশীল প্রতিভা মাতৃভাষার মাধ্যমেই মুক্তি পেতে পারে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য চাই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রাথমিক স্তরে। সেখানে বিদেশী ভাষার বোঝা ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেবে। বিভ্রান্তি আর বিতর্ক বিপুল জনগোষ্ঠিকে অশিক্ষার অন্ধকারেই রেখে দিবে, যেমন এতকাল তারা রয়েছে।